মা য়া বাঁ শী

মা য়া বাঁ শী

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
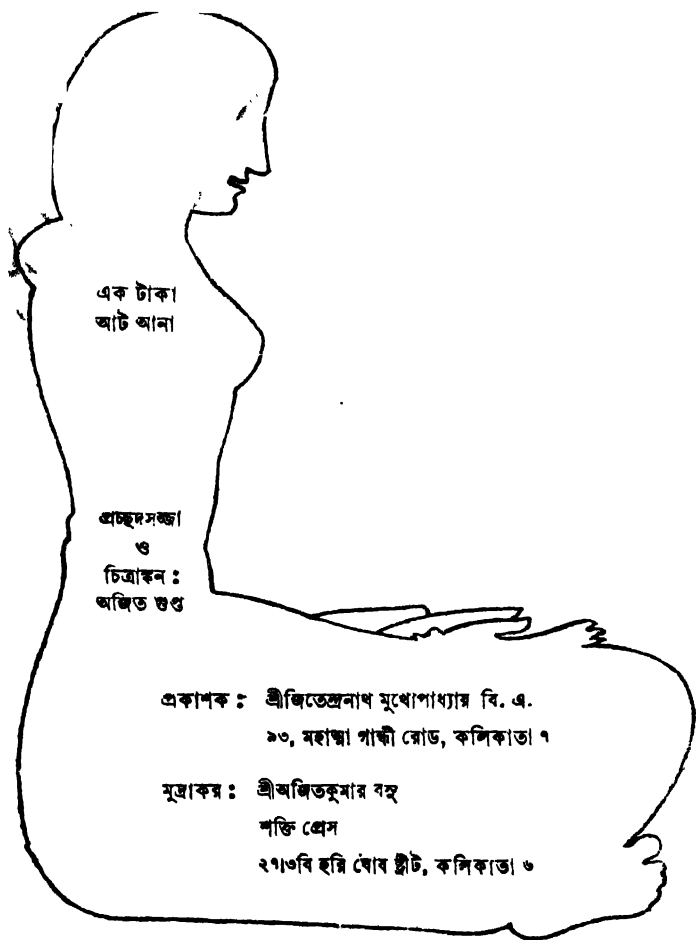
এক টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা
ও
চিত্রাঙ্কন :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭৷৩বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া পিতামহী বিশ্বেশ্বরী দেবী

ঠাকুরমা,

ছেলেবেলায় অনেক গল্প শুনিয়েছ, বড় হ'য়ে তোমাকে গল্প শোনাবার সুখ আমি পাইনি। তাই আজ এই কয়েকটি কথা তোমাকে দিলাম। তুমি স্বর্গ থেকে শুনে খুসী হও আর আশীর্ব্বাদ কর।

রবি

ভূমিকা

গ্রন্থের তিনটি গল্পই তিনটি বিখ্যাত ফরাসী গল্পের ছায়া। অবসর কালে নিজের ও ঘরে ছেলেদের চিত্তবিনোদনের জন্য লেখা; সুতরাং ভাষায় কোনরূপ অলঙ্কার বিন্যাসের প্রয়োজন বোধ করি নাই।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩১৮
কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মায়াবাঁশী

সেকালে এক রাজা ছিলেন। তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিরাট রাজত্ব, প্রচুর সৈন্যবল ছিল; আর ছিল এক পরম রূপবতী কন্যা, আর কোন সন্তান ছিল না।

রাজকন্যার ষোল বৎসর বয়স। বিবাহ দিতে হবে। রাজা ঘোষণা করলেন যে যারা রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চায় তাদের সংক্রান্তির দিন রাজবাড়ীর মাঠে উপস্থিত হতে হবে।

একে রূপবতী রাজকুমারী, তার উপর রাজার মৃত্যুর পর তিনি হবেন রাজ্যের রাণী; খবর শুনে দলে দলে লোক রাজধানীতে এসে জুটতে লাগল। কত রাজপুত্র, কত বিদ্বান, কত বীর,—রাজধানীতে আর স্থান হয় না। সকলে মাঠে উপস্থিত হ'লে রাজা প্রচার করলেন যে, রাজকন্যা

একটা সোণার আতা ছুঁড়বেন, সেই আতা যে ধরতে পারবে তাকে তিনটি কাজের ভার দেওয়া হবে ; সেই কাজ যদি সে সময়মত শেষ করতে পারে, তবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে ; নৈলে নয়। ঘোষণা শুনে ভীরু যারা, তারা পিছিয়ে পড়ল। শুধু দাঁড়িয়ে রইল দুশো রাজপুত্র, দুশো পণ্ডিত আর একজন রাখাল। রাখাল গরীব বটে, কিন্তু তার চেহারা রাজপুত্রদের কারো চেয়ে খারাপ ছিল না। কিন্তু রাখাল রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায়,—তার স্পর্দ্ধা দেখে মন্ত্রী পারিষদ সব হেসেই খুন। সে কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজকুমারী আতা ছুঁড়লেন, ধরলেন এক রাজপুত্র। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই। তাঁর উপর এক কাজের ভার দেওয়া হল। তিনি কিন্তু শুনেই ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীমুখো হলেন। আরও দুবার রাজকন্যা সোণার আতা ছুঁড়লেন। এবার যে দু'জন ধরলেন, তাঁরাও কেউ রাজার ফরমায়েসী কাজ করতে সাহস পেলেন না। শেষে চার বারের পর সোণার আতা পড়ল রাখালের হাতে। রাখাল বুক ফুলিয়ে রাজার সামনে এসে বললে, "কি কাজ করতে হবে, মহারাজ, হুকুম করুন।" মন্ত্রী পারিষদ সবাই রাখালের অহঙ্কারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। রাজা বললেন, "আমার দক্ষিণের আস্তাবলে একশো খরগোষ

আছে। কাল সকালে তাদের ছেড়ে দেবে, আবার সন্ধ্যাকালে ফিরিয়ে আনতে হবে। হুঁসিয়ার, একটিও যেন না হারায়। একটা কম হলে তোমার প্রাণ যাবে, এই হচ্ছে প্রথম কাজ।”

রাখাল ভাবল, এ আবার কি! গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল পাঁচ বছর বয়স থেকে চরিয়েছি কিন্তু খরগোষ তো কখনও চরাইনি। এটা দেখছি নূতন রকমের কাজ। আচ্ছা দেখা যাক। এই ভেবে রাখাল বললে, “মহারাজ, কাল দিনটা আমায় ভাববার সময় দিন। কাল বিকেলে জবাব দেব।” ভালয় ভালয় আপদ বিদায় হয় ভালই, এই ভেবে রাজা বললেন, “আচ্ছা বেশ, এক দিন তোমাকে ভাববার সময় দিলাম।”

রাখাল বিদায় নিয়ে ভাবতে বসল। রাজকন্যাকে বিয়ে করতে এসে এমন বিপদে পড়বে, সে আগে ভাবেনি। এখন কি করা যায়! ভাবতে ভাবতে রাখাল বনের দিকে চলল। কাঁটায় পা ছিঁড়ে রক্ত পড়তে লাগল, গাছের ডালে লেগে ছেঁড়া জামা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেদিকে খেয়াল নেই, রাখাল কেবলই চলছে। সহসা পায়ের শব্দে চমকে উঠে রাখাল দেখলে সামনে এক বুড়ী। বয়স হবে একশো বছর। সবগুলো দাঁত পড়ে গেছে। গায়ে কতকগুলো কাঁথা, মাথায় ধুচুনীর মত মস্ত একটা টুপী। সুন্দর ছেলেটার

মলিন মুখ দেখে বুড়ী জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কি ভাবছ বাছা ?"

"আর বলো না মাসী, রাজকন্যা বিয়ে করতে এসে মহা মুস্কিলে পড়েছি।" এই বলে সব কথা রাখাল বুড়ীকে খুলে বলল। বুড়ী বললে, "এই তো ? আচ্ছা, আমি এর উপায় কচ্ছি; তুমি ভেবো না। এই বাঁশীটা নাও।" বলে বুড়ী টুপীর ভেতর থেকে একটা হাতীর দাঁতের বাঁশী বের করে রাখালের হাতে দিলে। সুন্দর বাঁশী, দুধের মত রং। বাঁশী হাতে নিয়ে মুখ তুলতেই রাখাল দেখলে বুড়ী আর নেই। রাখাল খানিকক্ষণ "বুড়ী" "বুড়ী" ক'রে ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। বাঁশী দিয়ে কি করতে হবে ভেবে না পেয়ে রাখাল ধীরে ধীরে ফিরে গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আর অনাহারে ক্লান্ত হ'য়ে সে বাঁশী হাতে করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই রাখাল দেখলে হাতের মুঠোর ভিতর বাঁশী, দেখেই আগেকার দিনের সব কথা মনে পড়ে গেল; অমনি ছুটে গিয়ে সে রাজসভায় হাজির। বললে, "মহারাজ! কোথায় আপনার খরগোষ ? আমি রাজী আছি।" সভাসদেরা বললে, "ভেবে দেখো হে খোকা, শেষে লোভে পড়ে প্রাণ হারাবে ?"

"দেখেছি মশাই। প্রাণ তো যাবেই একদিন, না হয়

আজই যাক।" ব'লে রাখাল রক্ষীর সঙ্গে আস্তাবলের দিকে চলল। আস্তাবলের দরজা খুলতেই তিড়িং করে এক খরগোষ লাফ দিয়ে রাখালকে ডিঙ্গিয়ে দিল ছুট। সঙ্গে সঙ্গে আরো গোটা দশ পনের, কোন্ দিক দিয়ে যে ছুটে গেল, তা রাখাল দেখতেই পেল না। একশো খরগোষ গুণবে কি, পঁচিশটা গুণতেই আস্তাবল খালি হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে রাখালের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত হ'ল। কি করে, ফেরবার তো উপায় নেই।

এদিকে রাখালের অবস্থা দেখে সভাসদেরা সব হেসে লুটোপুটি। কেউ কেউ দুঃখ করে বল্লে, "গরীবের ছেলে রাজত্বের লোভে প'ড়ে শেষে প্রাণটা খোয়াল দেখছি।" রাখাল যেদিকে খরগোষ গেছে ভাবতে ভাবতে সেই দিকে চললো। গিয়ে দেখে, দু-চারটে খরগোষ মাত্র এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাকীগুলোর চিহ্নও নেই। তখন ভাবতে ভাবতে রাখালের মনে পড়ে গেল বুড়ীর দেওয়া বাঁশীর কথা। তখন জামার ভিতর থেকে বাঁশীটা বের ক'রে জোরে ফুঁ দিতেই যেখানে যত খরগোষ ছিল সব লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে রাখালের চারপাশে এসে জুটল। রাখালের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। এইবার! আর চাই কি! রাজকন্যা আর রাজত্ব। আর ঠকাবার যো নেই।

এদিকে রাজকন্যা তেতালার জানলা খুলে দেখলেন, একশো খরগোষ রাখালের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। সর্ব্বনাশ! শেষে রাজ-কন্যার বিয়ে হবে গরুর রাখালের সঙ্গে! কি লজ্জার কথা! কি করবেন ভেবে না পেয়ে দাসীকে ডেকে ছেঁড়া জামা আর ভিক্ষার ঝুলি আনতে হুকুম করলেন। সেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে আর ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে রাজকন্যা চললেন রাখালের কাছে।

রাখাল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, আর খরগোষগুলো কেউ মাথার কাছে, কেউ হাতের উপর শুয়ে আছে। রাজকন্যা এসে ডাকলেন। ধড়মড় ক'রে উঠে রাখাল চেয়ে দেখেই বুঝতে পারলে যে রাজকন্যা এসেছেন ভিখারিণীর বেশে।

"কি চাও তুমি?" রাখাল জিজ্ঞাসা করলে। রাজকন্যা বললেন, "একটা খরগোষ দেবে আমাকে? বেশী নয় একটা, দাম দেব।"

"কত দেবে?"

"পাঁচ হাজার টাকা!"

"ও দামে পাওয়া যায় না।"

"দশ হাজার।"

"তাতেও না।"
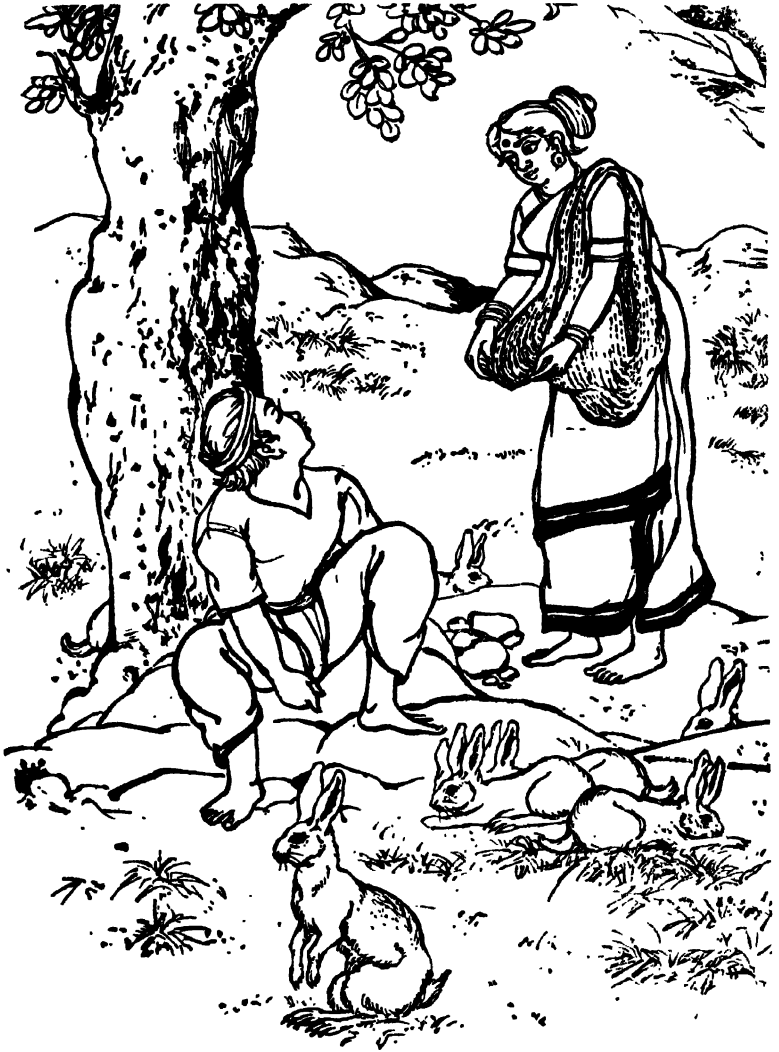
রাখাল চেয়ে দেখেই বুঝতে পারলে

"তবে কত চাও ?"

"শোন ঠাকরুণ রাজার রাজত্ব পেলেও এ খরগোষ আমি বেচবো না। তবে তুমি যদি চাও তবে দিতে পারি। কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কি ?"

"আমার পাশে আধঘণ্টা ব'সে গল্প করতে হবে।"

রাজকন্যার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। রাখালের পাশে মাটীতে ব'সে, আবার তারই সঙ্গে গল্প করতে হবে। উপায় কি! আধঘণ্টা একসঙ্গে ব'সে গল্প করলেই যদি একটা খরগোষ পাওয়া যায়, তাও ভাল। নৈলে সারাজীবন এই রাখাল ছোঁড়াটার সঙ্গে একত্র বাস করতে হবে যে। ভেবে রাজকন্যা বললেন, "আচ্ছা তোমার কথাতেই রাজী।" এই ব'লে রাখালের পাশে এসে বসলেন। আধঘণ্টা গল্প-গুজবের পর রাখাল রাজকন্যার হাতে একটা খরগোষ তুলে দিল। রাজকন্যার বড় অপমান বোধ হ'ল। কিন্তু কি করবেন ? উপায় নেই। খরগোষটি তুলে নিয়ে ঝুলিতে পুরে রাজবাড়ীর দিকে চললেন। খানিকটা দূর যেতেই রাখাল দিল বাঁশীতে ফুঁ। অমনি রাজকন্যার ঝুলি ছিঁড়ে খরগোষ রাখালের কোলের উপর এসে হাজির। রাজকন্যা মাথা হেঁট ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন।

এদিকে আবার রাজা চর পাঠিয়ে খবর নিলেন। চর

এসে বললে মহারাজ, একশো খরগোষ রাখালের আশে পাশে চ'রে বেড়াচ্ছে। রাখাল দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। শুনে রাজা অবাক হয়ে গেলেন, 'রাখাল যে অসম্ভব সম্ভব করলে দেখছি! রাজার মর্য্যাদা যায়। রাখাল শেষে রাজার জামাই হবে! দেখা যাক কি হয়।' এই ভেবে চাষার বেশ পরে, গাধায় চেপে রাজা চললেন রাখালের কাছে। রাখাল চাষার বেশে রাজাকে চিনতে পেরেই ব'লে উঠল, "কি চাও হে তুমি?" রাজার আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হল তখনই রাখালের মাথা কেটে নেন। কিন্তু কি করবেন? সোরগোল করলেই লোকজন এসে পড়বে। এ রকম বেশে রাজাকে দেখলেই প্রজারা সব হাসবে। রাজা মুখে হেসে বল্লেন, "একটা খরগোষ দেবে হে, ছোকরা? দাম পাবে।"

"কত?"

"পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

"বড় লম্বা-চৌড়া কথা বলছ দেখছি। নিজের জোটে না দুবেলা ভাত, কথা বলছ লাখ টাকার!"

"তুমি দেবে কিনা?"

"দিতে পারি, যদি একটা কাজ করতে পার।"

"কি কাজ বল?"

"তোমার গাধার লেজে যদি বার তিনেক চুমো দিতে পার।"

রাজার মুখ কালী হ'য়ে গেল। যদি কেউ দেখে ফেলে তবেই সর্ব্বনাশ!

কি করেন? মানের দায় বড় দায়। "আচ্ছা দেখি" বলে রাজা ভয়ে ভয়ে চারদিক চেয়ে দেখলেন, কেউ নেই।

তখন আস্তে আস্তে গাধার লেজটা মুখের কাছে তুলে প্রথম চুমো দিলেন। যে গন্ধ! চুমো খেয়েই রাজা "ওয়াক থুঃ" ক'রে উঠলেন। রাখাল খিল খিল করে হেসে উঠলো, "বেশ বন্ধু, আর দুবার, তাহ'লেই বড় খরগোষটা তোমার।" রাজা কটমটিয়ে চেয়ে কোন মতে আর দুটি চুমো দিয়ে খরগোষটাকে ঝোলায় পুরে গাধায় চেপে চললেন। খানিক দূর যেতেই রাখাল বাঁশীতে দিল ফুঁ। খরগোষও লাফিয়ে এসে রাখালের বুকের উপর পড়ল।

রাগে অপমানে রাজার শরীর জ্বলতে লাগলো। কোন মতে মনের রাগ মনে চেপে রাজা চললেন মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে। কিন্তু কেউ কারো কাছে নিজের দুর্দ্দশার কথা ভাঙ্গলেন না। নতুন কোন উপায়ে রাখালের হাত থেকে বাঁচা যায় কিনা, সেই পরামর্শ চলতে লাগল।

সন্ধ্যাকালে রাখাল হাসতে হাসতে রাজসভায় এসে

দাঁড়িয়ে বললে, "মহারাজ, আজকের কাজ তো শেষ হ'ল। কাল কি করতে হবে ফরমায়েস করুন।"

রাজা আগেই মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। মন্ত্রী রাজার আদেশ জানালেন।

"রাজার গোলায় এক গোলা ধান আর চাল মেশান আছে। বেশী নয়—হাজার মণ ধান আর হাজার মণ চাল। কাল রাতের মধ্যে ধান আর চাল পৃথক করতে হবে। পারবে?"

রাখালের মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভেবেছিল, খরগোষ চরাবার মতই কোন ফরমাস হবে; কিন্তু এযে দেখছি সাংঘাতিক রকমের হুকুম! এক রাতে হাজার মণ চাল আর ধান আলাদা করতে হবে।

মন্ত্রী রাখালের মুখ দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন, বললেন, "পারবে হে? ভেবে-চিন্তে জবাব দিও। একটা দানা চাল আর ধানেও যদি মিশে থাকে তাহ'লে প্রাণ যাবে।" রাখাল সাহসে বুক বেঁধে বললে, "কি ভয় দেখাচ্ছেন, মন্ত্রীমশায়? পরশু সকাল কেন দুপুর রাতেই দেখবেন, মহারাজের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল ক'রেছি।"

পরদিন রাতে ধানের গোলায় এসেই রাখালের ভয় হ'ল। প্রকাণ্ড গোলা—ধানে আর চালে বোঝাই। একবার মনে হ'ল, দরকার কি রাজকন্যা আর রাজত্ব? পালাই!

তারপর ভাবল, দেখি এবার বুড়ীর বাঁশী কি করে। এই ভেবে রাখাল বাঁশীতে ফুঁ দিল। আওয়াজ থামতে না থামতেই এক ঝাঁকে প্রায় লাখ খানেক চড়ুই এসে ধান আর চাল আলাদা করা স্বরু ক'রে দিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রাজার গোলার এক ধারে চাল, আর এক ধারে ধানের পাহাড় হ'য়ে গেল। রাখাল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোর না হ'তেই রাজা মন্ত্রী পারিষদ সঙ্গে ক'রে গোলায় এলেন। এসে রাখালের কাণ্ড দেখেই তো চক্ষু স্থির!

ছোঁড়াটা কি যাদু জানে? গণ্ডগোলে রাখালের ঘুম ভাঙ্গলো।

হাসিমুখে রাখাল রাজাকে বললে, "মহারাজ, তিন নম্বরের হুকুমটা এইবার ক'রে ফেলুন।"

"সন্ধ্যাকালে মন্ত্রীর কাছে জানতে পারবে" ব'লে মুখ হাঁড়ির মত ক'রে রাজা অন্দরে গেলেন রাণী আর রাজকন্যার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

সন্ধ্যার সময় মন্ত্রী এসে রাজার হুকুম জানালেন। "ওহে ছোকরা, বার বার এইবার। এতে যদি উৎরে যাও, তাহ'লে রাজকন্যা পাবে। রাজার ভাণ্ডার দেখেছ? খাবার জিনিসে

ভাঁড়ার বোঝাই হ'য়ে আছে। আজ রাত্রের মধ্যে খেয়ে ভাঁড়ার খালি ক'রে দিতে হবে, বুঝলে ?"

"কি খাবার আছে, মন্ত্রী মশাই ?"

"হরেক রকম ! এই ধর, প্রথম নম্বর সন্দেশ পাঁচমণ, দু নম্বর রসগোল্লা পাঁচমণ, সরপুরিয়া সাড়ে তিন মণ, ক্ষীর—"

"থামুন, মন্ত্রী মশাই, থামুন। আমার মুখে জল আসছে কিন্তু একাই খেতে হবে, না লোকজন নিমন্ত্রণ করা চলবে ?"

"না হে, একা। এখনও বোঝ, সাহস যদি না থাকে ফিরে যাও। যদি ফিরে যাও, রাজা তোমাকে বকশিস দেবেন।"

"না মশাই, এগিয়েছি যখন এতদূর তখন আর ফেরা হচ্ছে না। যা থাকে কপালে ; না হয় খেয়েই মরব।"

"দেখো বাবা, তোমার ভাল-মন্দ তোমার কাছে।"

মন্ত্রী ফিরে এলে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কিহে ? এবার রাখাল বেটা বলে কি ?"

"এবার যেন একটু ভয় পেয়েছে ব'লে বোধ হ'ল। দেখা যাক।"

দুপুর রাতে ভাঁড়ারে ঢুকেই রাখালের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। এসব খাবার সে জন্মেও চোখে দেখেনি। একবার

একটা রসগোল্লা মুখে ফেলে, কখনও একটা সন্দেশ ক্ষীরে ডুবিয়ে খায়, শেষে যখন পেট ভ'রে গেল তখন সে সারা গায়ে ক্ষীর মাখতে লাগল।

রাজবাড়ীতে দুপুর রাতের দামামা বাজল। সর্ব্বনাশ! সবই তো প'ড়ে রয়েছে! "দোহাই বাবা, বাঁশী, এবার আমার মান বাঁচাও—তোমাকে সোণা দিয়ে মুড়ে দেব" ব'লেই রাখাল বাঁশীতে ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাখো ইঁদুর এসে ভাঁড়ারে জুটল। "কুট কুট" ইঁদুরের দল ফলার আরম্ভ করে দিল।

হায়! হায়!! এমন সব খাবার ইঁদুরে খেয়ে মাটী কচ্ছে! উপায় কি? রাখালের পেট হ'য়েছে ঠিক জয়ঢাকের মত। আর একটা সন্দেশও পেটে রাখবার জায়গা নেই। রাখাল এক একবার পাগলের মত হ'য়ে ইঁদুর তাড়াতে যায়, আবার ফিরে আসে। ভাবে কচ্ছি কি? ইঁদুর সব যদি রাগ ক'রে পালায়, তা হ'লে আমারই সর্ব্বনাশ। যদি রাজকন্যা বিয়ে করতে পারি তাহ'লে রোজই তো রাজার জামাইয়ের এই সব জুটবে।

এই রকম নানা সুখের কথা ভাবতে ভাবতে রাখাল ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলা চোখ মেলতেই দেখে যে, ভাঁড়ার খালি।

মেঠাই কিম্বা ইঁদুরের চিহ্নমাত্রও নেই। এমন সময় মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজা এলেন।

আগেই রাজা ভাঁড়ারীর মুখে সব শুনেছিলেন। রাজাকে দেখে রাখাল বলে উঠলো, "তাহ'লে শ্বশুরমশাই, এইবার সম্প্রদানটা ক'রে ফেলুন।"

রাজা বললেন, "আর একটু বাকী আছে। এই যে ঝোলা দেখছ, এটা হ'চ্ছে মিথ্যার ঝুলি। এক ঘণ্টার মধ্যে মিথ্যা কথা ব'লে এই ঝোলা বোঝাই ক'রে দিতে হবে, তা হ'লেই রাজকন্যা তোমার।

"এযে চার নম্বরের ফরমাস। এরকম তো কথা ছিলনা।"

মন্ত্রী বললেন "এটা হ'চ্ছে হুকুমের লেজুড়! লেগে যাও।"

হুকুমের লেজুড়! রাজরাজড়ার সবই অদ্ভুত! গরীবের বাছা বয়সও বেশী নয়, এত মিথ্যা কথা কোত্থেকে জোটাবো? যা হোক দেখা যাক এবার বাঁশী কি করে?" জামা ও কাপড় হাতড়িয়ে রাখাল দেখে বাঁশীও নেই! "সর্ব্বনাশ! এইবার খেয়েছে! শেষে কূলের কাছে এসে নৌকা ডুবল!"

"ভাবছ কিহে, ছোকরা? লেগে যাও। পাঁচ মিনিট তো হ'য়ে গেল!"

রাখাল নানারকম মিছে কথা বলতে সুরু করল। ঝুলি আর ভরে না! আধ ঘণ্টা হ'য়ে গেল, ঝুলির সিকিও ভরল না।

রাজা হাসতে লাগলেন। মন্ত্রীরা সবাই হাসতে লাগল। দোতলার জানালা থেকে রাজকন্যা হাসতে লাগলেন।

তাঁর সখীরা সব বিদ্রূপ আরম্ভ করলে। রাখাল রেগে যা ইচ্ছা তাই বলতে লাগল, কিন্তু তাতেও ঝুলি ভরে না।

আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী আছে? হঠাৎ রাখালের মাথায় এক বুদ্ধি জাগল, বললে, "সবাই শুনুন মশাই, এই যে রাজকন্যা দেখছেন—উনি একদিন চাষার মেয়ে সেজে আমার কাছে খরগোষ নিতে এসেছিলেন। দামের বদলে আমার গালে দশটা চুমো দিয়ে গেছেন।"

"ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা"!

রাজকন্যা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন।

"এতে আর বেশী লজ্জা কি রাজকন্যা?" রাখাল বল্লে— "আপনার বাবার কীর্ত্তি যদি শুনতেন!"

রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ওহে ছোকরা, থাক! থাক!!" "থাকবে কি মহারাজ? শুনুন সবাই—আপনাদের এই রাজা আমার প্রথম পরীক্ষার দিন এক চাষা সেজে আমার কাছ থেকে একটা খরগোষ নেন। তার দাম দিয়েছিলেন তাঁর গাধার লেজে তিনবার—"

রাজার মুখ চূণ হ'য়ে গেল—সর্ব্বনাশ বলে কি!"

"তিনবার—শুনুন মন্ত্রীমশাই।"

"ওহে থাম থাম, আর দরকার নেই—হ'য়েছে হয়েছে।"

"হবে কি, মহারাজ? ঝুলি যে এখনও ভরে নি। তারপর মহারাজ তিনবার"—এইবার রাজা সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে রাখালের মুখ চেপে ধরে কানে কানে বললেন, "দোহাই বাপ, এত চাকর-বাকরের সামনে আর বুড়োকে অপদস্থ করো না, ক্ষান্ত হও।"

"যে আজ্ঞা! তবে রাজকন্যার আসতে আজ্ঞা হোক।" রাজকন্যা সেজে এলেন। রাখাল রাজার জামাই হ'ল। রাজকন্যার ভয় ভেঙ্গে গেল। দেখলেন রাখাল গুণে কোন রাজপুত্রের চেয়ে খাটো নয়। বিয়ের রাতে রাখালের বুড়ী মা এল; সেই বাঁশী-বুড়ীও এসেছিল।

বাসরঘরে রাজকন্যা তাঁর বাপের গাধার লেজে চুমো দেওয়ার কথা শুনে হেসে লুটোপুটি হলেন। রাখাল রাজার জামাই হ'য়ে পরম সুখে কাল কাটাতে লাগল।

ফরাসী ঔপন্যাসিক ডুমা হইতে।

তপস্বী

এসিয়া মহাদেশে অতি প্রাচীন কালে বাবিলন রাজ্য ছিল। আজ বাবিলনের নাম মাত্র আছে। সে ধন-দৌলত সৈন্য-সামন্তের চিহ্নমাত্র নেই। এক সময়ে বাবিলনের রাজা ছিলেন মোয়াবদার। তাঁর সময়ে রূপবান, গুণবান ও ধনী এক যুবক, জডিগ তার নাম, সেই দেশে বাস করত। সংসারের শোকতাপ পেয়ে তার মনে হঠাৎ দারুণ বৈরাগ্যের উদয় হ'ল; সে লোটা আর লাঠি হাতে বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে একেবারে ইউফ্রেতিস নদীর ধার দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। ইউফ্রেতিস প্রকাণ্ড নদী। আজ যদি কেউ তোমরা পারশ্য দেশ দেখতে যাও, তবে সে নদী দেখতে পাবে। সকালে সে চলতে সুরু করত, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটানা সমান চ'লে যেত—কোথাও থামত না। তার

উদ্দেশ্য ছিল, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। কিছুদিন ভ্রমণের পর সে দেখলে যে, তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্ত্তে সে দারুণ বাতব্যাধি লাভ ক'রেছে। তখন জডিগ দিন কয়েকের জন্য বিশ্রাম করবার মৎলব ক'রে এক গ্রামের দিকে চলল। গ্রামে ঢুকতেই সে দেখে যে এক সাধু একটি খেজুর গাছের নীচে ব'সে প্রকাণ্ড একখানা পুঁথি খুলে বসে খেজুর খাচ্ছেন। একরাশ সাদা লম্বা চুল তাঁর ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। মাথার চুল থেকে পরণের পায়জামাটি পর্য্যন্ত তাঁর ধবধবে সাদা। দেখে জডিগের মনে বড় ভক্তি হ'ল। সে সাধুর কাছে গিয়ে নমস্কার করে বললে, "প্রভু, প্রকাণ্ড কেতাব খানা কি?" "এটা হচ্ছে, অদৃষ্টের পুঁথি। তুমি তো বাপু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার জন্য ঘুরে মরছ; দেখ দেখি বুঝতে পার কি না।" বলে সাধু বইখানা জডিগের হাতে তুলে দিলেন। খাতা খুলেই জডিগের চক্ষু স্থির! পৃথিবীর অনেকগুলি ভাষা সে জানত, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত অক্ষর কোনো দিন তার চোখে এ পর্য্যন্ত পড়েনি।

"কিছুই তো বুঝতে পারলাম না, প্রভু," ব'লে জডিগ বইটা সাধুর হাতে দিল।

"বুঝবে হে বাপু, বুঝবে। দিনকতক থাক আমার সঙ্গে, সব তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

"আমারও তাই ইচ্ছা। আপনার সেবা ক'রেই জীবন কাটাতে ইচ্ছা ক'রেছি।"

"তা বেশ ভাল কথা। তবে একটি কথা এই যে আমার কোনও ব্যবহার যদি অদ্ভুত ঠেকে তবে আমাকে কিছু বোলো না। শুধু দেখে যেও। যদি কিছু বল, কিম্বা আমার কোনও কাজে বাধা দেও, তবে আর আমাকে দেখতে পাবে না!"

"আচ্ছা তাই হবে" ব'লে জডিগ সাধুর সেবায় মন দিল।

দিন কয়েক এম্‌নি ক'রে কাটল। একদিন সাধু বললেন, "চলহে, দেশ-ভ্রমণ ক'রে আসা যাক। কেমন যাবে?"

"আজ্ঞে যাব বৈ কি।"

"তবে চল। কিন্তু আমার উপদেশটা যেন মনে থাকে। আমার কোনও কাজে বাধা দিতে পারবে না।" ব'লে সাধু জডিগকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন।

২

দুইজনে সমস্ত দিনমান চ'লে এক রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তার সোনার সিংহদ্বারের উপরে হীরার গম্বুজ। তার উপরে লাল পতাকায় মুক্তার ঝালর। সিপাহী শান্ত্রীদের

পোষাকে সব জরির কাজ করা। জডিগ দেখে অবাক হ'য়ে গেল। সাধুকে জিজ্ঞাসা করলে, "এদেশের নাম কি প্রভু?" সাধু বললেন, "দেশের নাম, সোনার দেশ। এ দেশের মত ঐশ্বর্য্য আর কোন দেশের নেই।" সাধু সিংহদ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। জডিগ ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে চলল। খানিক দূর গিয়ে জডিগ দেখলে যে প্রকাণ্ড বাড়ী, তার চারি পাশে হাজার হাজার লোক;—কেউ গান গাচ্ছে, কেউ খেলছে, কেউ বাজাচ্ছে—এই রকম। কারো যে কোনরূপ চিন্তা আছে দেখে তা বোধ হয় না।

বাড়ীর দরজায় রূপার চৌকাটে সোণার কবাট, তাতে নানা রকম হীরা মাণিক বসানো। দরজার দুপাশে দুটি সিংহ দুটি পোষা কুকুরের মত ব'সে আছে। তাদের দেখেই জডিগ ভয়ে থমকে গেল।

"ভয় কি হে, চলে এস।" ব'লে সাধু একেবারে জডিগের হাত ধ'রে যে ঘরে বাড়ীর কর্ত্তা ভোজে ব'সেছিলেন সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাঁরা যেতেই চাকর এসে দু'জনকে এক রূপার টেবিলের ধারে বসিয়ে দিল। টেবিলের উপর রাজ্যের ফল মূল, নানারকম সুখাদ্য ব্যঞ্জন। সারাদিন হেঁটে হেঁটে জডিগের বেশ ক্ষুধা বোধ হ'য়েছিল। সাধুর জন্য অপেক্ষা করবার আর তার সবুর সইল না। সে খেতে বসে

গেল। আহার শেষ হ'লে তাঁদের হাত ধোবার জন্য তকমাপরা এক চাপরাশী এসে সোনার ঘটিতে জল দিয়ে গেল। বাড়ীর কর্ত্তা কিন্তু আপন মনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প ক'রে যাচ্ছেন, যেন এই অতিথিদের সঙ্গে কথা বলবারও তাঁর ফুরসৎ নেই। সমস্ত কাজ কলের মত হ'য়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল, তখন এক চাকর এসে সাধু আর জডিগকে একটা প্রকাণ্ড আয়নামোড়া ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে সোনার পালঙ্কে পালকের গদী। পালঙ্কের ধারে কার্পেটের পাপোষ। ঘরের কোণে টেবিলের উপর সোনার ঘটিতে মুখ ধোবার জল। সমস্ত ঘরে সোনা রূপার জিনিসের ছড়াছড়ি। দেখে জডিগ কেবলই অবাক হয়ে ভাবছিল, আর সাধু হাসছিলেন। এই ঘরে তাঁদের রেখে চাকর চলে গেল। তখন সাধু জডিগকে বললেন, "এখন চল বেরিয়ে পড়া যাক।" "এত রাত্রে কোথায় যাবেন?"—জডিগ বললে। "যে দিকে দুই চক্ষু যায়, চল।" ব'লে জডিগের হাত ধরে সাধু চোরের মত ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন, যাবার সময় ঘরের সোনার ঘটীটা ঝোলার ভিতর নিয়ে গেলেন।

জডিগ দেখলে, কিন্তু কোনও কথা বললে না। মনে কিন্তু তার বড় রাগ হ'ল। লোকটা চর্ব্বচোষ্য দিয়ে পেট

ভরে খাওয়ালে, আর কিনা তারই জিনিস চুরি করা! কিন্তু মুখ বন্ধ। কিছু বলবার যো নেই। কাজেই মনের রাগ মনে চেপে সাধুর সঙ্গে সে চলতে লাগল।

৩

পথে পথেই সারা দিনমান কাটল। সন্ধ্যাকালে এক গ্রামে এসে দুজনে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে সাধু হাঁকলেন, "কে আছ? দরজা খুলে দাও।" প্রথম ডাকে কেউ সাড়া দিল না। তারপর সাধু জোরে দরজায় এক ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে কেউ নাকিস্বরে বললে, "বাড়ীতে কেউ নেই।"

সাধু হেসে বললেন, "কি রকম কথা! এই যে কথা বলছ!"

"তাতে কি তোমার? আমি যদি দরজা না খুলি।"

"দরজা তোমাকে খুলতেই হবে। যদি না খোল তবে এমন ধাক্কা দেব যে, দরজা কেন তোমার বাড়ীশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়বে।"

অমনি ভিতর থেকে সেই নাকিস্বর চীৎকার ক'রে উঠল, "এই খুলছি, খুলচি, দরজা ভেঙ্গ না, দরজা ভেঙ্গ না।"

সরাই আছে সেইখানে যাও

এই বলতে বলতে একজন লম্বা এবং রোগা গোছের ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, একটা হাতা লম্বা, আর একটা ইঁদুরে কেটে অর্দ্ধেক করে ফেলেছে। মুখ শুকনো। প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়াটি সিন্ধু-ঘোটকের দাঁতের মত নীচের থেকে ঝুলে প'ড়েছে। তিনি দুটি অপরিচিত লোককে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাতে কি চাও তোমরা ?"

সাধু একটা নমস্কার করে বললেন, "মহাশয়ের নাম শুনেছি। আজ রাত্রের মত একটু আশ্রয় চাই।"

"আশ্রয় ? ও সব এখানে হবে না। সরাই আছে, সেইখানে যাও।"

সাধু বললেন, 'পয়সা নেই, মশাই, কাজেই সরাইমুখো আর হইনি। তা মহাশয়ের এখানেই আজ রাতে—কি বল জড়িগ ?"

জড়িগ আর কি বলে ? কর্ত্তার মুখ দেখেই তার ক্ষুধা পালিয়ে গেছে। তবুও কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, "কাজেই।"

তখন সাধু ঘরে ঢুকতেই বাড়ীর কর্ত্তা দরজা দুহাতে আগুলে বললেন, "বেরোও আমার বাড়ী থেকে ! বেরোও— ভণ্ড তপস্বী, চোর জোচ্চোর !" আরো বোধ হয় কিছু তার বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জড়িগের রুক্ষমূর্ত্তি দেখে কিছু বলতে

পারলে না। সাধু ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেই দেখেন যে, টেবিলের উপর খানদুই পোড়া রুটী আর এক গেলাস জল। তখন আর বাক্যব্যয় না করে একখানা রুটী মুখে দিয়েই ইসারায় জড়িগকে ডাকলেন। জড়িগ এসে বাকী একখানা গালে পুরে চুপচাপ বসে রইল। বাড়ীর কর্ত্তার তো চক্ষুস্থির! এরকম অদ্ভুত রকমের অতিথি তাঁর ভাগ্যে পূর্ব্বে আর জোটেনি। সাধু হেসে কর্ত্তাকে বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমাদের শোবার বন্দোবস্ত আমরা নিজেরাই করে নিচ্ছি।" এই বলেই একেবারে ঘরের কোণে খাটিয়ায় খড়ের যে বিছানা পাতা ছিল তারই উপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন। জড়িগ চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লে, শোবার মত বিছানা আর কোথাও নেই। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে রেকাবী আর গেলাসটা সরিয়ে রেখে সেইখানে গায়ের চাদরটা বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। অতিথিদের ব্যবহার দেখে কর্ত্তাবাবু একেবারে হতভম্ব। কি আর করবেন? জড়িগের পালোয়ানের মত চেহারা দেখে আর তাঁর গালাগালি দিতে সাহস হচ্ছিল না। কাজেই বিড় বিড় করতে করতে তিনি সদর দরজা বন্ধ করতে গেলেন। এদিকে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তপস্বী আর জড়িগ ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের দিকে জড়িগ হঠাৎ চমকে উঠে দেখলে সাধু

তাকে ডাকছেন, "উঠে পড়, পালাই চল।" "এবারও কিছু চুরি নাকি?" "না, এবার দান। এই দেখ, বলে যে সোনার ঘটিটা চুরি করে এনেছিলেন সেটা টেবিলের উপর রেখে জড়িগের হাত ধরে সাধু পথে বেরিয়ে পড়লেন। যে লোকটা এত অসম্মান করল তার উপর সাধুর এই অদ্ভুত অনুরাগের কারণ কিছু না বুঝতে পেরে জড়িগ হাঁ করে চেয়ে রইল। সাধু জড়িগের মনের ভাব বুঝে বললেন, "চুপ! যা করি দেখে যাও। একটা কথাও বোলো না।"

৪

এ দিনটাও পথে পথে কাটল। সন্ধ্যাকালে একটি ছোট গাঁয়ে দু'জনে এসে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে ছোট একটি কুঁড়ের দরজায় এসে সাধু ডাকলেন, "ওগো, আমরা দুটি অতিথি।" কথা শেষ হতে না হতেই একটি বুড়ো লোক এসে দরজা খুলে দিল। তারপর হাত জোড় ক'রে বললে, "আসুন, ভিতরে আসুন, গরীবের বাড়ী দয়া করে এসেছেন, যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল আছে গ্রহণ করুন।"

বুড়োর আগ্রহ দেখে দুজনে বড় খুসী হলেন। ঘরে ঢুকে দেখলেন, ঘরখানি ছোট বটে কিন্তু বেশ পরিষ্কার। ছোট একখানি টিপাইয়ের উপরে গুটি কয়েক বনের ফল। বুড়ো

এসে ফল কয়টি দুজনকে ভাগ করে দিল। দুজনে খেতে খেতে বুড়োর জীবনের কাহিনী শুনতে লাগলেন। বুড়োর চার ছেলে চার মেয়ে। স্ত্রী অনেক দিন মারা গেছে। ছেলে চারটি জাহাজে চাকুরী করে ; অল্প-স্বল্প মাইনে পায়। মেয়ে কয়টি বড় লক্ষ্মী, শ্বশুরবাড়ী আছে। জামাইদের ভাল রকম যৌতুক দিতে পারেনি ব'লে, তারা মেয়েদের ছেড়ে দেয় না। সেই দুঃখেই বুড়ো মরার মত হয়ে আছে। সাধু সব কথা শুনলেন। নিজে একটি কথাও বললেন না। আহার শেষ হলে বুড়ো কোথা থেকে এক ঝুড়ি শুকনো পাতা নিয়ে এসে ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিল। তার উপরে নিজের গায়ের ছেঁড়া কম্বলখান বিছিয়ে শীতে হি হি ক'রে কাঁপতে লাগলো। জড়িগ বাধা দিতে যাচ্ছিল, সাধু ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করলেন। বুড়ো তখন বললে, "আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, কেউ এখানে বিরক্ত করবে না। সকালে এসে আমি ডেকে ঘুম থেকে তুলব।"

শেষ রাত্রে সাধুর ডাকে জড়িগের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাধু বলছেন, "তোলো তোমার তল্পী-তল্পা, বেরোও।"

"বুড়োর সঙ্গে দেখা না করে ?" "ফিরবার পথে দেখা কোরো। তখন অনেক কথা বলতে পারবে, চল।" এই ব'লে জড়িগের হাত ধ'রে ঠেলে পথে নিয়ে এলেন।

জড়িগ পথে বেরিয়ে ফিরে দেখে বুড়োর ঘরে আগুন। 'আগুন' বলে চেঁচিয়ে উঠবে, এমন সময় গালে পড়ল বিরাশী শিক্কা ওজনের সাধুর এক চড়। জড়িগ রুখে উঠতেই সাধু বললেন, "আগুন দিয়েছি আমি নিজে। কেন দিয়েছি জিজ্ঞাসা কোরো না।" জড়িগের মন একেবারে ছোট হয়ে গেল। এত আদর যত্ন যে লোকটা করলে, একখানা কুটীর যার সংস্থান নেই, তার যথাসর্ব্বস্ব কুঁড়েখানা পুড়িয়ে সাধুর কি পরমার্থ লাভ হল! মনে মনে বললে, নেমকহারাম জানোয়ার। চেয়ে দেখে যে তিনি হাসছেন। দেখে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলে উঠলো, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

সমস্ত দিন সাধু কতরকম হাসির গল্প করতে করতে চললেন। জড়িগের সে দিকে কান ছিল না। শুধু ভাবছিল সাধুর অদ্ভুত ব্যবহারের কথা। সাধুর এই নৃশংস আচরণ দেখে তার মনে দারুণ ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। একবার মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্ত্তেই সাধুর সঙ্গ ছেড়ে সে চলে যায়। কিন্তু শেষ অবধি না দেখে আর এই ভণ্ড তপস্বীকে একবার সায়েস্তা না করে সে যাবে না। এই রকম একটা ছোট সঙ্কল্পও সে মনে মনে করে নিয়েছিল।

রাত্রের আঁধার যখন ঘনিয়ে এল, তখন সাধু একটা ছোট

বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে গেলেন। জড়িগ তাঁর পিছু নিল। সে বাড়ীটা একটী বুড়ীর। সে তার এক বোনপোকে নিয়ে সেই বাড়ীতে থাকে। সাধুকে দেখে বুড়ী তার হাতের কাজ ফেলে উঠে এল। তারপর নমস্কার করে আসন এনে দিল। সাধু বসে বুড়ীর সঙ্গে নানা রকম আলাপ করতে লাগলেন। তার বোনপো এসে জড়িগের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। জড়িগ একবার করে কথা বলছিল আর সাধুর দিকে চাইছিল। মনে ভয় ছিল পাছে সাধু বুড়ীকে গলা টিপে মেরে ফেলে। বুড়ী আর তার বোনপোর আদর যত্নে জড়িগের তাদের উপর অত্যন্ত মমতা হল। সাধু ঘুমুলে সে রাতভোর জেগে রইল, পাছে সাধু বুড়ীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন, এই আশঙ্কায়। সারারাত সাধু নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেন। সকালবেলা উঠে মুখ হাত ধুয়ে বুড়ীর কাছথেকে সাধু বিদায় নিলেন। বুড়ীর বোনপো তাঁদের এগিয়ে দিতে সঙ্গে গেল।

গ্রামের বাইরে ছিল-একটা ছোট নদী। নদীটা ছোট বটে কিন্তু তাতে স্রোত বড় দারুণ। ছোট্ট একটী বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে লোকজন এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যাতায়াত করত। সাধু আর সে বুড়ীর বোনপো আগে, আর জড়িগ তাদের হাত দশেক পিছনে চলছে। এমন সময় বিকট

এক আর্ত্তনাদ শুনে জড়িগ চেয়ে দেখে যে বুড়ীর বোনপোর টুঁটি ধরে সাধু তাকে সাঁকোর উপর থেকে নদীতে ফেলে দিচ্ছেন। জড়িগ লাফিয়ে গিয়ে সাধুর হাত ধরতেই, শব্দ হল ঝুপ্—আর সেই সঙ্গে বুড়ীর বোনপো চোখ উলটিয়ে নদীর জলে তলিয়ে গেল। তখন জড়িদের মাথায় খুন চেপে গেল।

"এইবার ভণ্ড! তোমার পালা এইবার। তোমাকে একবার চুবিয়ে নিই"—এই বলে সাধুর চুল চেপে ধরতেই জড়িগ দেখলে সাধু আর নেই সেইখানে, তারই বয়সের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানি তার ফুলের মত সুন্দর, চোখ দুটী হাসিতে ভরা। জড়িগ চমকে উঠল। এ মূর্ত্তি সে ছবিতে দেখেছে। দেখেই চিনল। একি, দেবদূত গ্রেব্রিয়েল তার সম্মুখে! হাত জোড় করে বললে, "না বুঝে অপরাধ করেছি, দেবদূত ক্ষমা করুন।"

দেবদূত বল্লেন, "শোন জড়িগ্, আমার ব্যবহার দেখে তুমি আশ্চর্য্য হয়েছ। সোনার দেশের জমিদারের সোনার ঘটি চুরি করেছি, কেন জান? ভবিষ্যতে তিনি আর তাঁর সোনারূপার জাঁকজমক কাউকে দেখাবেন না। কৃপণ ঘটি পেয়েছে, ভবিষ্যতে এই রকম পাওনার লোভে সে দুটি একটি শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত পথিককে আশ্রয় দেবে। বুড়োর বাড়ী পুড়িয়েছি। বাড়ীর বদলে বুড়ো ছাই সরাতে গিয়ে মাটীতে

পোঁতা হাজার পঞ্চাশ মোহর পাবে। আর তোমার বুড়ীর বোনপো? আজ যদি তাকে না মারতাম, তবে সে টাকার লোভে তার বুড়ী মাসীকে দিন তিনেকের মধ্যেই খুন করত—বুঝলে? এই সব বোঝ—আর ভাব যে দুনিয়ায় যা ঘটছে তার পিছনেই মঙ্গল অদৃশ্যভাবে রয়েছে। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিওনা। তুমি এত কষ্ট পেয়েছ ব'লেই সংসার ছেড়েছিলে, তাই আমার সঙ্গেও তোমার দেখা হয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা না হলে, তুমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হতে, আর তোমার জীবন শেষ হত, আত্মহত্যায়।"

জডিগ মুখ তুলে দেখে, দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তখন উদ্দেশে নমস্কার করে সে আবার সংসারে ফিরে চলল; দেবদূতের এই কথায় তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মন থেকে একেবারে চলে গিয়েছিল।

ফরাসী ঔপন্যাসিক ভলটেয়ার হইতে।

কুলী

সে অনেক দিনের কথা। ঠিক কত দিনের কথা ইতিহাসও তা বলতে পারে না। জাপানের বড় সহরে এক কুলী ছিল। তার কাজ ছিল রাস্তায় বসে পাথর ভাঙ্গা। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই সে কেবলই পাথর ভাঙ্গছে। রোদে মুখ কালো হ'য়ে গিয়েছিল, আর বেশী বৃষ্টিতে মাথার সব চুল উঠে গিয়েছিল, তবু তার কাজের বিরাম ছিল না। দারুণ রোদে সবাই সরবৎ খাচ্ছে আর খোলার ঘরে ঘুমুচ্ছে, বেচারী খোলা রাস্তায় রোদে ঘামছে, পিপাসায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু তার হাতুড়ী চলছে খট্ খট্।

একদিন হঠাৎ তার মনে বড় দুঃখ হল। সে বিড়্ বিড়্ ক'রে বকতে সুরু করলো, "ভগবানের কি অন্যায়! সেই কোন্ ভোরে রাস্তায় বসেছি পাথর ভাঙ্গতে, আর উঠব সেই

এক প্রহর রাতে—এর মধ্যে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। যদি বড় লোক হতে পারতাম! সকাল বেলা কাজের কোন তাড়া নেই, ন'টার সময় ঘুম ভাঙ্গল, চাকর-বাকর সব সামনে খাবার নিয়ে হাজির আছে, ভাল ভাল. ফলমূল খেয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুতে লাগলাম; চাকর বাতাস করতে লাগল। পিপাসার সময় গেলাসখানেক আপেলের রস খেলাম; সন্ধ্যার সময় ফুলেল আতর মেখে তাঞ্জামে চেপে ঘুরে এলাম, তার পরেই ভরপেট খেয়ে এক ঘুম। তার পরদিন আবার বেলা ন'টা। কি স্ফূর্ত্তিই হ'ত তাহ'লে।"

আকাশ দিয়ে দেবদূত যাচ্ছিলেন। কুলীর কথা শুনতে পেলেন। তাঁরা দেবদূত, অতি ছোট কথাও শুনতে পান। এমন কি মানুষের মনের কথা পর্য্যন্ত। তাই কুলীর মনের কথা শুনে বললেন, "আচ্ছা তাই হোক।"

হঠাৎ কুলীর মনে হ'ল, হাত খালি হাতুড়ী নেই। চার পাশে চেয়ে দেখে, লোকেরা কেউ বাতাস কচ্ছে, কেউ খাবার হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় হাতুড়ী, আর কোথায় পাথর! সে বসে আছে নরম গালিচার উপর। হাতে হাতুড়ীর বদলে মসলা ভরা একটী সোনার পানের ডিবে। দেখে শুনে কুলীর মন খুসী হ'য়ে উঠল। ছিল কুলী হ'ল জমিদার। সে কেবলই হুকুম চালাতে লাগল।
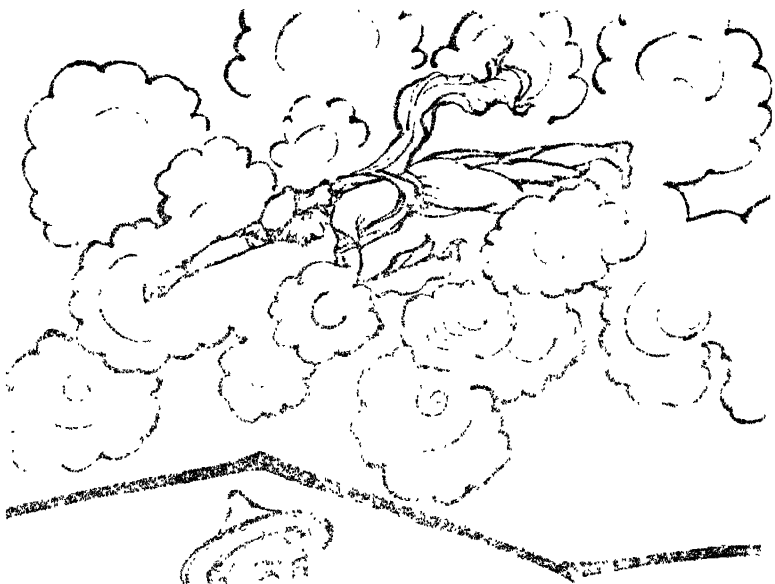
আকাশ দিয়ে দেবদূত যাচ্ছিলেন

সন্ধ্যার সময় হাজার পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে মিকাডো যাচ্ছেন। জাপানের সম্রাটকে 'মিকাডো' বলে। মিকাডোর সামনে রস্থনচৌকী বাজাতে বাজাতে লোকজন চলেছে। কত হাতী ঘোড়া লোক লস্কর। কুলীর হিংসা হল। সে জিজ্ঞাসা করলো, "এত সোরগোল করে যায় কে হে, আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে?" চাকর জবাব দিল, "উনি হচ্ছেন এদেশের রাজা, মিকাডো।" "মিকাডো কি আমার চেয়ে বড়?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।"

"বটে! আমার চেয়ে বড় লোকও এদেশে আছে দেখছি। হায়, হায়! জমিদার না হয়ে একেবারে মিকাডো হ'তে চাইলেই তো ভাল হোতো। একেবারে দেশের রাজা হতাম, কারো তোয়াক্কা রাখতাম না।"

আকাশে দেবদূত ছিলেন, বললেন "তাই হবে।"

হঠাৎ কুলীর বোধ হল হাতে আর মাথায় মস্ত বোঝা। চেয়ে দেখে হাতে সোনার ডিবের বদলে প্রকাণ্ড এক সোনার ডাণ্ডা;—মাথায় টাকের উপর ছু'সের এক সোনার মুকুট! গালিচার জায়গায় এক সিংহাসনে সে ব'সে, আর সামনে চাকর বাকরের জায়গায় মন্ত্রীরা সব সার-বেঁধে দাঁড়িয়ে। তার পেছনেই সৈন্য-সামন্তেরা দলে দলে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ছু'জন দাসী, ছুদিকে চামর ঢুলাচ্ছে। আর এক

সিপাহী প্রকাণ্ড এক হীরে বসান সোনার ছাতা মাথার উপর ধরে আছে। কুলী একটু অবাক হয়ে সামনের দাড়ীওয়ালা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কে হে ?"

বুড়ো মন্ত্রী জবাব দিলে, "আপনি ? আপনি পৃথিবীর ঈশ্বর। মহিমান্বিত জাপানের সম্রাট। আপনার ইচ্ছাই পৃথিবীর আইন, আপনার ইঙ্গিতেই আদেশ—সমস্ত পৃথিবী তা মেনে চলতে বাধ্য ! আমরা সকলে আপনার দাসানুদাস, —আদেশের প্রার্থী, করুণার প্রার্থী।"

"বেশ, ভাল ! ভাল !! আমি তা হলে মিকাডো। জাপান আমার, পৃথিবী আমার কি বল ? এই সৈন্য-সামন্ত এরাও আমার ?"

"হাঁ রাজরাজেশ্বর।"

"তবে এদের হুকুম দাও, পৃথিবীতে জাপান ছাড়া যত দেশ আছে সব জয় করে আসুক।" "যে আজ্ঞা।" মন্ত্রী সম্রাটের আদেশ জানালে সেনারা জয়ধ্বনি করতে করতে যাত্রা করলো।

এদিকে দিন কয়েক থেকে দারুণ রোদে পৃথিবী শুদ্ধ লোকজন অস্থির। একমাস মোটে বৃষ্টি নেই। গাছপালা সব রোদে কালো হয়ে গেছে। নদীতে জল নেই, সমুদ্রের তল পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

সেদিন দরবার। দেশের গণ্যমান্য লোকজনদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। মিকাডো মন্ত্রী পারিষদ সঙ্গে ক'রে অপেক্ষা করে বসে আছেন,—কেউ আর আসে না। দূত এসে খবর দিলে কেউ আজ আসবে না।

মিকাডো গরম হয়ে বললেন, "আসবে না কেউ? কেন?"

"সম্রাট্! রোদে কারো বেরোবার যো নেই। গাছপালা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পথ-ঘাট তেতে আগুন।"

"বটে! এতদূর আস্পর্দ্ধা সূর্য্যের। যাও উজীর বল সূর্য্যকে যে, মিকাডো তাকে আকাশ থেকে চলে যেতে হুকুম করলেন।"

মন্ত্রী গিয়ে ফিরে এসে বললেন, "সম্রাট ভয় হচ্ছে, সূর্য্য আপনার আদেশ গ্রাহ্যই করলে না।"

"বটে, নিয়ে যাও ফৌজ; বেটাকে বেঁধে নিয়ে এস।"

খানিকক্ষণ পরে মন্ত্রী ও ফৌজ সব ফিরে এল। মন্ত্রী মুখ নীচু করে বল্লেন, "সম্রাট তাজ্জব ব্যাপার! সূর্য্য বেটাকে ধরা গেল না। অনেক উঁচুতে রয়েছে সে। যতই উঁচুতে উঠছি ততই আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। এখন কি আদেশ হয়?"

মিকাডোর বড় দুঃখ হল, বললেন, "এরকম রাজত্ব ক'রে

লাভ কি ? একটা আকাশের জোনাকি, সেও স্বচ্ছন্দে আমার হুকুম অগ্রাহ্য করলে ! আশ্চর্য্য ! একবার সূর্য্য হতে পারলে” কথা শেষ না হতে হতেই কুলী হু হু শব্দে আকাশে উঠতে লাগল। দেবদূত দূর থেকে হাসতে লাগলেন।

ছোটলোক যদি হঠাৎ বড় হয়, তা হলে তার মনের অবস্থা কেমন হয়, তা তোমরা জান। আকাশে উঠেই কুলী আপনার প্রতাপ প্রকাশ করা সুরু করে দিল। লোকের প্রাণ যায়। ভোর না হতেই কুলী এমন প্রচণ্ড রোদ ছাড়তে আরম্ভ করে দিল, তা দেখে আসল সূর্য্যেরও মুখ কালী হয়ে গেল। গাছপালা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মানুষ, পশু পক্ষীর গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

দেবতারা প্রমাদ গণলেন। তাঁরা যুক্তি করে প্রকাণ্ড একখানা মেঘকে হুকুম করলেন, “যাও তো হে, তুমি এক বার সূর্য্য বেটাকে ঢেকে খানিকটা বৃষ্টি করে দিয়ে এস, নৈলে যে সৃষ্টি রসাতলে যায়।” মেঘ “যে আজ্ঞা” বলে এসে সূর্য্যকে আড়াল করে বৃষ্টি আরম্ভ করে দিল। লোকের প্রাণ বাঁচল। সকলে রাশি রাশি ফুল ফল এনে মেঘকে পূজা কর্ত্তে বসল। দেখে কুলীর মাথা হয়ে গেল গরম। “বটে ! একটা ফড়িং মেঘ,—হাওয়া লাগলে উড়ে যাবেন সাত সমুদ্দর পারে ;

বেটার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! এও দেখছি আমাকে গ্রাহ্য করে না। সূর্য্য না হয়ে যদি মেঘ হতাম—” যেই বলা অমনি কুলী দেখলে যে শরীরটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। চোখ মেলে দেখলে যে আকাশের মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানা মেঘ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। “আচ্ছা রোসো, এইবার দেখছি কোন্ বেটা মেঘ আমার সঙ্গে টক্কর দেয়, এমন জলই ঢালব—” বলেই কুলী বৃষ্টি আরম্ভ করল। সাতদিন সাতরাত বৃষ্টি আর থামে না, রাস্তা ভেসে নদী হল। খাল বিল ভরে গেল। সমুদ্র ছেপে উঠে দেশ ভাসিয়ে দিল। জীব-জন্তু সব জলে ভাসতে লাগল। দেশে হাহাকার উঠল। শস্য নষ্ট হল। দেশে দুর্ভিক্ষ হল। রাজরাজড়া ভিখারী হলেন। তবুও বৃষ্টি থামে না। এমন সময় কুলী দেখলে যে এত বৃষ্টিতেও একটা পাহাড় কিছুতে গলছে না। বড় বড় গাছ-পালা ভেসে গেল, দালান-কোঠা খসে পড়ল। কিন্তু পাহাড় সেই যে চুপচাপ বসে রয়েছে—যেন পৃথিবীতে কিছুই হচ্ছেনা। তখন কুলীর বড় অপমান বোধ হল। সে বলে উঠল, “হায়রে! এত করেও পৃথিবীর সমস্ত জিনিষগুলো একসঙ্গে জব্দ করতে পারলাম না। যদি পাহাড় হতাম! দেবদূত দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, হেসে বললেন, “তথাস্তু!” কুলী একেবারে আকাশ থেকে ঝুপ করে একটা

পাহাড় হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে গেল। বৃষ্টি থামল, সৃষ্টি বাঁচল।

পাহাড় হয়ে কুলী ভাবল, "এই ঠিক, এই আমার বেশ হয়েছে। কত বাঘ ভালুক—যাদের দেখলে বড় বড় জোয়ান আঁৎকে উঠে—তারা বুকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পিঁপড়ে। আমার মত বীর কে?" কুলী খুসী হয়ে কিছু দিন রইল। এই রকমে দিন যায়। কুলী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এমন সময় সহরে নতুন রাস্তা তৈরী হবে। মিকাডো রাজ্যের যত পাথর ভাঙ্গতে হুকুম দিলেন। লাখ কুলী শাবল আর হাতুড়ী দিয়ে যত পাহাড় ভাঙ্গতে সুরু করে দিল। হঠাৎ কুলীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পায়ে যেন কে খোঁচাচ্ছে। চোখ মেলে দেখে তারই আগেকার চেহারার মত এক কুলী বিড়ি টানতে টানতে হাতুড়ী দিয়ে তাকেই ভাঙ্গছে। কুলী চটে লাল হয়ে গেল। আমাকে ভাঙ্গে! কিন্তু করবেন কি? হাত-পা নাড়বার যো নাই। হাতুড়ী পড়ছে খট্ খট্। নাঃ—আর না—এর চেয়ে কুলী হওয়াই ভাল। তা হ'লে শাবল দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে—অমনি দেবদূত অট্টহাস্য করে বললেন, "তাই হোক! ঘুরে ফিরে তাই হও, সেই তোমার ভাল। কিছুতে যার সন্তোষ নেই, তার উন্নতি কোন মতে

হয় না। এইটে ভেবে রেখো।" বলে দেবদূত আকাশে চলে গেলেন। কুলী সেই রাস্তার ধারে রোদে বসে হাতুড়ী শাবল নিয়ে পাথর ভাঙ্গতে লাগল। এবার আর তার কোন আপত্তি ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে সে পাথর ভাঙ্গত। কোন দিক চাইত না—কারো উপর আর হিংসা করত না।

ফরাসী গল্পলেখক কোয়েত্রেল হইতে